EXPLORING THE LINKS: GENDER ISSUES IN MARRIAGE AND MIGRATION

Rajni Palriwala and Patricia Uberoi

আন্তঃরাষ্ট্রীয় পারিবারিক জীবন এমন একটি বিষয় যা গনমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা খুব বেশি করে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে যেমন শিশু ও মহিলা পাচার, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদেশে পাচার, যুবক যারা পণ নিয়ে দেশের বাইরে উধাও হয়ে যায়, serial groom যারা অল্প কিছু সময়ের জন্য স্ত্রীয়ের সাথে সময় কাটায় তারপর স্ত্রীয়ের যাবতীয় অলংকার সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে যায়, এবং একইভাবে অন্য আরেকজন মহিলার সাথে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এইরূপ শঠতার আশ্রয় নিয়ে, যাদের অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে যেতে হয় এবং স্বামী হিসেবে দ্বায়িত্ব কর্তব্য পালনে অক্ষম হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে হতাশা জাহির করে, ভিসা এবং অভিবাসন র‍্যাকেট যারা নকল বিবাহের মধ্য দিয়ে লোক ঠকায়। দেশের অভন্ত্যরে একইভাবে বিবাহ ও অভিবাসনকে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদেরসাথে ছলনার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই অভিবাসন বা মাইগ্রেশনের অন্য আরো একটি দিকও রয়েছে। এই অভিবাসন পরিবারের মধ্যেকার যে লিঙ্গবৈষম্য তার পুনর্নির্মাণ ঘটায়। মহিলাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং বিভিন্ন রকম শোষন থেকে মুক্ত করে এবং নিজের ও স্বামীর পরিবারে তথা সমাজে সম্মান বাড়াতে সহায়তা করে, বিবাহজনিত অভিবাসিত মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচলতার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বিবাহ ও অভিবাসনের এই যে আন্তঃসম্পর্ক তা শুধুমাত্র শোষন ও বঞ্চনার কারণ হিসেবে দেখলে চলবে না। এই সম্পর্ককে নিরপেক্ষভাবে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্ব অভিবাসনের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সালে অভিবাসনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৯% মহিলা এবং বালিকা দেখা গেছে এবং এই অভিবাসনকারীদের একটা বড়ো অংশ দেখা যায় পরিবারের সদস্য হিসেবে, গৃহ কর্মচারী ও সেবা প্রদানকারী, যৌন কর্মী প্রমূখ হিসেবে। যদিও সাম্প্রতিক সময় অবদি মনে করা হত যে অভিবাসনকারীরা মূলত পুরুষ এবং মহিলাদের এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ ঘটে নির্ভরশীল বা ডিপেন্ডেণ্ট হিসেবে যারা পরিবারের অংশ হিসেবে তাদের স্বামীর সাথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যান। বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসনের বিষয়টি নির্ধারিত হয় আত্মীয়তার বন্ধন ও রীতিনীতি দ্বারা যা আবার রাজনৈতিক অর্থনীতির বাইরে অবস্থান করে। বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসনের মাধ্যম ও অর্থনৈতিক ভূমিকার কথা অগ্রাহ্য করে মহিলাদেরকে বিবাহ অভিবাসন সংক্রান্ত সকল গবেষণা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। মহিলাদের অভিবাসন সম্পর্কিত গবেষণায় স্থান দেওয়ার জন্য নারিবাদীরদের মধ্যে বিপরীতধর্মী ভাবনা চিন্তা কাজ করছিল । একদিকে তারা বিবাহিত অভিবাসী হিসেবে নারিদের অর্থনৈতিক অবস্থানের সমালোচনাকে খারিজ করেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলাদের স্বাধীনভাবে কাজ করা ও কাজ সংক্রান্ত অভিবাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে কিছু নারীবাদী রয়েছেন যারা মহিলাদের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখে যেখানে তারা তাদের স্বামীর পরিবারের অঙ্গ হিসেবে অভিবাসন

প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে পরে। স্ত্রীয়েরা পরিবারের সঙ্গে তার নিজের ও তার স্বামীর দূরত্ব মেটানোর ও সম্পর্ক ধরে রাখার কাজ করে। 'Patriarchy within Marriage and the Larger Society' নামক লেখাতে তুলে ধরা হয় কিভাবে মহিলাদের কাজকে হেয় করা হয়, এবং পুরুষদের ক্ষমতা , উপার্জনকারী হিসেবে পুরুষদের ও গৃহস্থালীর কাজে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। অর্থনীতি ও আধুনিকীকরণ বনাম বিবাহ ও ঐতিহ্য- এই পোলারাইজেশন বা বিভাজনের পেছনে বেশ কিছু বিষয় কাজ করছে।

প্রথম ঃ অভিবাসনকারী মহিলাদের অর্থনৈতিক দিকটি বোঝার ক্ষেত্রে নারীবাদীদের মতে মহিলাদের বিবাহঘটিত এবং পারিবারিক ও অন্যদিকে শ্রমিক হিসেবে অভিবাসনের দিকগুলীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয়নি। পরিবার চালানোর ক্ষেত্রে বাড়ির মহিলাদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রত্যেকেই শ্রমিক যেহেতু তারা পরিবারের জন্য শ্রম দান করছে। কিন্তু তাদের শ্রমের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়না। ফ্যান এবং লি , চায়নার গুয়াংদং অঞ্চলে তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে শ্রমিক অভিবাসন বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসনের মধ্যেই ঘটতে পারে। স্বল্প বয়সের শ্রমিকরা তাদের কাজের জায়গায় তাদের জীবনসঙ্গী কে খুঁজে পায়। অন্যদিকে মহিলাদের বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসন পুরুষদের আরও বেশী করে বহিরঅভিবাসনের দিকে ঠেলে দেয়।

আরো একটি উদাহরন হল ফিলিপিন এর অভিবাসী যারা কানাডায় কাজের সন্ধানে যায় । অনেক মহিলা যারা ফিলিপিন এ কাজের সন্ধানে যায় তারা বেতনভুক্ত শ্রমিক হিসেবে লোকের বাড়িতে এবং সেবা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করে এবং কয়েকদিনের মধ্যে কানাডিয়ান ব্যক্তিকে বিবাহ করে এই ভেবে যে এই বিবাহের মধ্য দিয়ে তারা unskilled কাজের বাইরে বেরনোর পথ পাবে। কিন্তু দেখা গেল বিবাহের পরেও তারা স্বামীর সংসারে একই কাজ করছে তাও আবার পারিশ্রমিক ছাড়া।

দ্বিতীয়তঃ নতুন মাত্রায় যে নারী অভিবাসনের চিত্র সামনে আসছে, এবং যেভাবে স্ত্রীয়েরা, যৌন কর্মীরা এবং গৃহ সহায়িকাদের বিভিন্ন জায়গায় অভিবাসন ঘটছে তা এই ধারনাকেই খারিজ করছে যে শুধু পুরুষদের মধ্যেই অভিবাসন ঘটছে এবং মহিলারা পুরুষদের অনুসরন করে তাদের সঙ্গে অভিবাসিত হচ্ছে।

গৃহ সহায়িকাদের ভূমিকা আরো বেশি করে বাড়ছে তার কারন আধুনিক প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতে সেবা প্রদানের ঘাটতি রয়েছে। বিবাহ ও পারিবারিক কাঠামোয় পরিবর্তন আসার ফলে , এবং বাড়ির মহিলাদের বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজ করার ফলে পরিবারের সদস্যদের খেয়াল রাখা ও তাদের যত্নের ব্যাপারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে (হসচাইল্ড)। সেই ঘাটতি পূরণ সম্ভব গৃহকার্যে সমপরিমান সহযোগিতা, নতুনভাবে কাজের তালিকা প্রস্তুত করে, ও সাধারন সেবা পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য নেওয়ার মধ্য দিয়ে। দশ বছরেরও কম সময়ে সেবা পরিষেবায় যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে মহিলা গৃহসহায়িকা ও স্ত্রীদের আন্তরাষ্ট্রীয় স্তরে অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে। এই সমস্ত কিছুর ফলে একটা global care chain তৈরী হয়েছে । অভিবাসনের নারীকরণের ফলে এশিয়া থেকে (বিশেষ করে

ফিলিপিন, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া থেকে) বিপুল সংখ্যক মহিলা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সেবা প্রদানকারী হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছে। এই আন্তরাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানের কাজটি শুধুমাত্র উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের সামাজিক অবস্থা ধরে রাখতেই সাহায্য করে না, সেসকল দেশে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বজায় রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উন্নত দেশের অভিবাসন নীতিসমূহ দুই ধরনের অর্থনৈতিক উদ্বেগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। একদিকে যত্নের ঘাটতি এবং স্বল্প বেতনে চাহিদা মেটানোর অভাব, অন্যদিকে গৃহকার্যে সহায়তা করার মতো লোকের অভাব এবং জনকল্যানমূলক পরিষেবার উপর উদারনৈতিক অভিবাসনের দরুন অর্থনৈতিক চাপ। অন্যদিকে অভিবাসিত মহিলা কর্মচারীরা তাদের দেওয়া পরিষেবার বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন করে তার একটা অংশ তারা তাদের পরিবারে পাঠায় যা তাদের পরিবারের লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করে ।

নারীদের শ্রম সংক্রান্ত অভিবাসন নিয়ে যে ধারনা তাকে নারীদের অভিবাসন সংক্রান্ত ধারনায় খুব একটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়নি। নারীদের বরাবরই গৌন অথবা সহযোগী অভিবাসনকারী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের দিকেও সম পরিমান গুরুত্ব দিতে হবে, বিবাহের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলো ভালো করে বুঝতে হবে।

Marriage Rules : Patrilocality and Territorial Exogamy

নৃতত্ত্বে বিবাহ পরবর্তী বাসস্থান সংক্রান্ত যে সব নিয়ম রয়েছে অর্থাৎ বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রী কার বাড়িতে থাকা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা এক প্রকার আত্মীয়তার ব্যবস্থা থেকে অপর প্রকার আত্মীয়তার ব্যাবস্থাকে পৃথক করে। নব বিবাহিত দম্পতি একসাথে পৃথকভাবে থাকতে পারে যাকে বলা হয় নবস্থানিক পরিবার (neo local residence) , আবার স্ত্রী তার স্বামী ও তার পরিবারের সাথে থাকতে পারে যা পিতৃস্থানিক (virilocal/ patrilocal) অথবা স্বামী তার স্ত্রী ও তার পরিবারের সাথে থাকতে পারে যা মাতৃস্থানিক (Matrilocal/uxorilocal) পরিবার নামে পরিচিত। পিতৃস্থানিক পরিবারে স্ত্রীয়েরা তাদের পতিগৃহে যায় ফলে তাদের একপ্রকার বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসন ঘটে। এই সব ক্ষেত্রে বিবাহ নির্দিষ্ট্য একটি বংশের বাইরে (পিতৃবংশ) এবং নির্দিষ্ট্য একটি স্থানের (যেমন নিজের গ্রামের) বাইরে সংঘটিত হয় যাকে বলা হয় territorial exogamy. বিবাহ সংক্রান্ত এইসব এক বা একাধিক নিয়মের পৃথকভাবে বা একত্রে নিজের গ্রামের বাইরে এবং দূরের কোন অঞ্চল থেকে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এশিয়ার অনেক জায়গায় এই নিয়মগুলো যুবতী মহিলার জীবনের একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চায়না এবং ভারতে যেখানে পিতৃস্থানিক পরিবারই মূলত দেখা যায় সেখানে মহিলাদের বিবাহের পর নতুন পরিবেশে , নতুন লোকেদের মাঝে মানিয়ে নিতে হয় এবং নতুন সম্পর্কের মধ্যে নতুন নতুন কাজ করতে হয়। নব বিবাহিত মহিলাদের বিবাহের পর নতুন বাড়িতে গিয়ে এমন সমস্ত কাজ

করতে হয় যা হয়ত তারা তাদের পিতৃগৃহে কখনও করেনি। নতুন পরিবারের একজন হয়ে উঠতে, সেই পরিবারের লোকেদের চাওয়া পাওয়া বুঝতে তার বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায়। সে তার স্বামীর সাথে নতুন সংসার শুরু করলেও সে তার ছেড়ে আসা পিতৃপরিবারকে কখনই ভুলতে পারেনা। বিবাহের মধ্যে দিয়ে মহিলারা স্থায়ীভাবে অভিবাসিত হয়।

বিবাহ পরবর্তী বাসস্থান সংক্রান্ত নিয়মগুলো বিবাহের পর কে কার বাড়িতে যাবে এই আলোচনায় বিশেষ স্থান পায়নি কারন পশ্চিমের দেশগুলোতে নব স্থানিক পরিবারই হল প্রচলিত ধরন। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেখা গেছে যে যেসকল সমাজে পিতৃস্থানিক পরিবারই হল নিয়ম সেখানে মোট মহিলা অভিবাসনের একটা বড়ো অংশ হল মহিলাদের বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসন। বাসস্থানের এই লিঙ্গগত দিকটি আরো বেশি করে বোঝা যায় যখন পিতৃস্থানিক বাসস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয় আত্মীয়তার নিয়ম, বংশ, পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। এবং এর ফলে একপ্রকার পিতৃতান্ত্রিক আত্মীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় যা বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের অন্যান্য পুরুষ ও মহিলাদের উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠীত করে। (উবেরয় , ১৯৯৫)

এই আলোচনায় খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসনের আলোচনায় লিঙ্গের দিকটি সম্পর্কে কোন আলোচনাই করে হয়নি। রক্তের সম্পর্ক, বিবাহ ও আত্মীয়তা সংক্রান্ত নিয়মসমূহ বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তবে বিবাহ পরবর্তী বাসস্থান , বা বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসনের পরবর্তী সময়ে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা দেখা যায়নি। পিতৃস্থানিক ও নিজ অঞ্চল বহির্ভূত বিবাহের যে নিয়ম রয়েছে তা পিতৃতান্ত্রিক ব্যাবস্থাকে ধরে রাখতে সহায়তা করেছে।

বিগত কয়েক বছরে নারীবাদী গবেষকগন পিতৃস্থানিক পরিবার ও নিজ অঞ্চল বহির্ভূত বিবাহকে সমালোচনা করেছেন। তারা বিবাহ সংক্রান্ত এইসব নিয়মের তিনটি দিকের উল্লেখ করেছেন যা মহিলাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে, পরিবারে তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে এবং বৈধব্য বা বিবাহ বিচ্ছিন্না হলে নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। (আগরওয়াল ১৯৯৭)। প্রথমটি হল মহিলাদের কন্যা হিসেবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিশেষ করে চাষযোগ্য জমির ক্ষেত্রে। যেহেতু জমি একটি স্থাবর সম্পত্তি তাই জমির উপর কন্যার অধিকার তা সে রাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত হলেও সে যদি বিবাহের পর পতিগৃহে চলে যায় তাহলে সেই জমির উপর নিজের অধিকার দাবি করা কঠিন হয়ে পরে। অথবা এমন ভাবেও বলা যায় যে পিতৃস্থানিক পরিবার ও নিজ অঞ্চল বহির্ভূত বিবাহের রীতি আরো বেশি করে মহিলাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা জমির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। (চৌধুরী, ২০০৭)।

দ্বিতীয়, এটা ধরেই নেওয়া হয় যে বিবাহের পর স্ত্রীদের তাদের স্বামীর গৃহের আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি সম্পর্কে বিশেষ ধারনা তৈরী হয়না তাই সেই পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রেও স্ত্রীদের বিশেষ ভূমিকা থাকেনা। স্বামীর পরিবারের প্রতি স্ত্রীদের আনুগত্য নিয়েও প্রশ্ন থাকে তাই সম্পত্তির বিষয়েও স্ত্রীদের বিশেষত কোন অধিকার থাকেনা (পালরিওয়ালা ১৯৯৬)।

তৃতীয়ত, বিবাহের পর স্ত্রীদের সুরক্ষা, মুশকিলের সময় তাদের পাশে থাকা এবং নিজের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো এইসবকিছুর সঙ্গে তাঁর পিতৃপরিবারের সদস্যদের যোগাযোগ

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাড়ির আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ তাদের বিবাহবিচ্ছেদ বা বৈধব্যর মতো বিপর্যয়ের সময় সাহস যোগাতে ও মনোবল বাড়াতে সাহায্য করে।

আধুনিক সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ, গ্রামে – শহরে। নিজের অঞ্চলের মধ্যে বা বাইরে , দেশে বা বিদেশে অভিবাসন নিজের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ির মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমে বাড়িয়ে চলেছে। অন্যদিকে অনেক দুরের বিবাহ অভিবাসন , শ্রমিক অভিবাসনের মত তাদের সামাজিক ও বস্তুবাদী সকল আশা পূরন করেছে একটা সুন্দর জীবন তৈরীর জন্য এবং পরিবারের নজরদারি থেকেও বেরোন সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি ঐতিহ্যশালী বিবাহ সংক্রান্ত রীতিনীতি ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং আধুনিক ব্যবসা ভিত্তিক বিবাহ শুরু হওয়ায় অভিবাসনকারী মহিলারা বিত্তশালী পরিবারে বিবাহ করে এবং তাঁর নিজের পরিবার থেকে দূরে সে একা হয়ে পরে ।

Marriage for Mobility

অভিবাসন, বা আরও স্পষ্টভাবে বললে স্বেচ্ছায় অভিবাসন সাধারনত হয়ে থাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লম্ব সচলতার লক্ষ্যে। একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে মানুষ জীবনের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বা ভালোভাবে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিবাহের আশ্রয় নেয়। বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসনের সঙ্গে শ্রম সংক্রান্ত অভিবাসনের তুলনা করা হয় যেহেতু নারী ও পুরুষের সামাজিক মূল্যায়ন ঘটে অনুলোম বিবাহের মতো সাংস্কৃতিক ধারনার উপর ভিত্তি করে যেখানে মহিলারা বিবাহ করে নিজের পছন্দের জায়গায় অভিবাসন হবে বলে। বাসস্থান সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, ভিসা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা, অভিবাসন সংক্রান্ত নানা নিয়ম, নাগতিকত্বের নানা শর্ত, এসবের মাঝে বিবাহ হল সারাজীবনের অভিবাসন অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই সফল একটি পন্থা। বেশীরভাগ সমাজে বিবাহের মধ্য দিয়ে উল্লম্ব সামাজিক সচলতা ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধির একটা সুযোগ তৈরী হয়। তামিল ব্রাহ্মিণদের মধ্যে দেখা গেছে যে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সুযোগ হাতছাড়া করেনা। ইউ কালপাগাম এর কাজ থেকে উঠে আসে যে তামিল ব্রাহ্মিণ পরিবারগুলো তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক যোগাযোগ আরো উন্নত করার লক্ষ্যে তাদের সন্তানদের এমন কারো সাথে বিবাহ দেন যারা আমেরিকায় চাকরী অথবা পড়াশুনা করে। তারা এই বিবাহকে বলেন ‘আমেরিকা বরণ’ বা American ‘boon/marriage alliance’ । পাত্রদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় তারা সেই দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে কিনা তাঁর ভিত্তিতে। আর পাত্রীদের নির্বাচন করা হয় তারা কতটা ঘরোয়া, সুন্দরী, রান্না এবং ঘরের কাজ জানে কিনা আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কিনা, ঠিক ঠাক জাতির কিনা, জন্মপত্রিকা মিলছে কিনা এসবের ভিত্তিতে। একইসাথে তার শিক্ষাগত যোগ্যতাও বিচার করা হয় কারণ তা ভিসা পাওয়ার বিষয়ে বা পাত্রের সাথে খাপ খাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এছাড়া বিপুল পরিমানে পণ দেওয়া নেওয়া তো রয়েছেই। তামিল ব্রাহ্মিণরা নিজেদের সন্তানের বিবাহের লক্ষ্যে তাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সকলকে বিদেশে থাকে বা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গেছে এমন পাত্র বা পাত্রী খোঁজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

তামিল ব্রাহ্মনরা উপযুক্ত আমেরিকান পাত্র বা পাত্রী পাওয়ার আশায় নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বাড়িয়ে এবং রঙ লাগিয়ে বলে। তারা এই আশায় থাকে যে নিজের সন্তানকে বিদেশে বসবাসকারী পাত্র বা পাত্রীর সাথে বিবাহ দিলে নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও অভিবাসিত হওয়ার একটা সুযোগ তৈরী হয় বিবাহ , চাকরি বা পড়াশুনার সূত্রে। এই প্রসঙ্গে এস্তার গাল্লো-র কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানে তিনি মালায়ালী মহিলাদের ইতালিতে অভিবাসনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর মতে কেরালার সিরিয়ান খ্রীষ্টান মহিলারা ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর শুরুর দিকে ইতালিতে গিয়েছিলেন নান হওয়ার লক্ষ্যে। তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারন তাদের অতি সাধারন পরিবার তাদের ভালো পরিবারে বিবাহ দেওয়া বা পণ দেওয়ায় সমর্থ ছিল না। এইসকল মহিলারা নান হওয়ার জন্য ইতালি গেলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যে কনভেন্ট ছেড়ে দেয় এবং একটা ভালো চাকরিতে ঢোকে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শুধু তাই নয় তারা নিজের পরিবারের সদস্যদেরও ইতালিতে অভিবাসনের সুযোগ করে দেয়। সুতরাং আমরা এখানে অভিবাসনের দুটো বিপরীতধর্মী চরিত্র দেখতে পাচ্ছি। এখানে মহিলারা বিবাহ থেকে দূরে থেকে নান হওয়ার জন্য ইতালি গেলেও তারা সেখানে শেষমেশ সংসারে আবদ্ধ হল। গাল্লো বলেন যে লিঙ্গ ও আন্তঃপ্রজন্মগত সম্পর্কের উপর অভিবাসনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

মহিলারা বিদেশে অভিবাসিত হলে অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, নিজের পছন্দমত চাকরি করে বাড়িতে টাকা পাঠান। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হল বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দমতো সঙ্গী নির্বাচন করেন । এই আলোচনা থেকে মূলত দুটো জিনিস সামনে আসে।

প্রথমত, সম্বন্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ সম্পর্কিত অভিবাসন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদা নয় সেই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের চাহিদা ও স্বপ্ন পূরনের একটা উপায়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিস্তর ফারাক হওয়ার দরুন একজন নারীর একজন পুরুষের সাথে মনের মতো স্থানে বিবাহের ব্যাপারটি নিজের নিজের চাওয়া পাওয়ার চেয়েও বেশী পরিমানে নির্ভর করে তার নিজের পরিস্থিতি ও তাতে যেসকল কাঠামোগত বাধা আসে রয়েছে তার দ্বারা।

টেরেসিটা এল রোসারিও-র গবেষনায় ফিলিপিনা আমেরিকান ইন্টারনেট প্রেম এর চিত্র তুলে ধরেছেন। আমেরিকার জীবনযাত্রার মান ফিলিপিনোদের তুলনায় অনেকটাই উন্নত সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রোসারিও-র গবেষনার উত্তরদাতাগন দারিদ্র্য থেকে বেরোনর জন্য আমেরিকান্দের সাথে প্রেমঘটিত সম্পর্কে লিপ্ত হয়না। ফিলিপিনো মহিলারা সকলেই শিক্ষিত, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত, চাকুরীরতা। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ভেদাভেদসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া ফিলিপিনো স্ত্রীদের আমেরিকান স্বামীর কাছ অভিবাসনের একটা অসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। ফিলিপিনোদের কাছে ইন্টারনেট প্রযুক্তি তাদের বাধাহীনভাবে প্রেম করার একটা সুযোগ দিয়েছে যেখানে পরিবারের বা গোষ্ঠির নজরদারি থাকবে না। যাদের সাথে মনের মিল হচ্ছেনা তাদের একটা বোতাম টিপে দূর করে দেওয়া সম্ভব আবার যাকে পছন্দ তার সাথে বাড়ির লোকের আলাপ করিয়ে দেওয়াও সম্ভব। উত্তর আমেরিকার বেশ কিছু সঙ্গী তাদের ফিলিপিনো পার্টনারকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে ইচ্ছুক হয় তার কারণ

তাদের মধ্যে এখনও পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যা পশ্চিমে বহুদিন আগেই হারিয়ে গেছে। দুপক্ষের দুরকম চাহিদা তাদের এই বৈবাহিক সম্পর্ক ধরে রাখতে সহায়তা করে। এইরূপ বিবাহের অভিবাসনের ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে মহিলাদের নিজস্ব মতামতের দ্বারা পাত্র নির্বাচনের একটা জায়গা তৈরী হয়। এই প্রক্রিয়া মেল অর্ডার ব্রাইড নামে পরিচিত। কিন্তু যদিও এই প্রক্রিয়ার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে নারীদের বস্তু হিসেবে কল্পনা করা হয় যাদের পুরুষেরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ি বেছে নেয়। মেল অর্ডার ব্রাইডের ব্যাবারটা যথেষ্ট জটিল । বর্তমানে মহিলাদের পাত্র নির্বাচনে নিজেদের ইচ্ছে এবং তাদের উপর অর্থনৈতিক শোষনের যে সীমারেখা রয়েছে তা অনেকটাই ধূসর হয়ে গেছে।

Commercially Negotiated Marriage

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে টাকাপয়সা ও বানিজ্যিক আদানপ্রদানের প্রশ্ন সনযুক্ত হওয়ায় তা এক অন্য মাত্রা পায়। বানিজ্যিক আদান প্রদানের বিষয়সমূহ বিবাহকে গৃহস্থ থেকে আত্মীয় সেখান থেকে ব্যক্তি আদানপ্রদান বা পাচারের পর্যায় নিয়ে গেছে। লিঙ্গ ভিত্তিক ব্যবসায়িক আদানপ্রদান যেসকল সমাজে বিবাহের সময় পণ নেওয়া হয় সেইসব সমাজের পক্ষে খুব জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চায়নাতে, বেশ কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ভারতবর্ষে বেশ কিছু জাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা দেখা যায়। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিবাহ সংক্রান্ত লেনদেনকে খুব সহজেই কন্যা কেনা বা কন্যা বেচা হিসেবে বলা হয়। একজন নারীকে কেনার পর তাকে তার স্বামী অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রী করে দিতে পারেন যৌন কর্মে লিপ্ত করার জন্য।

সম্বন্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে বাড়ির লোক , আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী বা স্থানীয় ঘটোকের উপর নির্ভর করতে হয় । অন্যদিকে প্রেম বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের ভাল লাগা, বা পছন্দ এবং দুজন ব্যক্তির একে অন্যকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়ার উপর নির্ভর করে। দূরবর্তী বিবাহ সম্পর্কিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থিত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব মারফত যোগাযোগ করা হয় অথবা খবরের কাগজ, বা পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান দেওয়ার বিভিন্ন সংস্থা, ইন্টারনেটের পাত্র পাত্রী খোঁজার বিভিন্ন সাইট, বা আধুনিক কালের বিভিন্ন ডেটিং সাইট যেখানে ছেলে মেয়েরা আলাপ পরিচয় করে , কথা বলে, একে অন্যেকে পছন্দ করে। মহিলা , পুরুষ ও পরিবারের লোকজন এইসকল বানিজ্যিক সংস্থাগুলোর উপর আজকাল ভরসা করে তার কারন মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেকটাই কম হওয়ার দরুন, অর্থনৈতিক বা অন্য কোন অসুবিধের যা স্থানীয় লোকেদের কাছে লুকনো যায়নি, বিবাহজনিত পণ না দিতে পারার কারনে, স্থানীয় লোকেরা যেমন পছন্দ করছে তা তাদের পছন্দের সাথে মিলছেনা এইসমস্ত কারনে, অথবা শুধুমাত্র প্রেম খোঁজার উদ্দেশ্যে।

স্ত্রী পাচারের লক্ষ্যে বানিজ্যিকভাবে সম্বন্ধ স্থাপনের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে মেলোডি ল্যু তার গবেষনায় আলোচনা করেছেন। তিনি তার গবেষনায় তাইওয়ানিস পুরুষদের সঙ্গে চায়না ও দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার মহিলাদের বিবাহের প্রসঙ্গ তাঁর গবেষণায় তুলে ধরেন। ১৯৯০ থেকে তাইওান এর বিবাহ সম্পর্কিত অভিবাসন ক্রমশ বেড়ে চলেছে যার মধ্যে ২৭.৪% বিবাহই হল

দেশের বাইরে । তাইওয়ানে স্ত্রীদের পাচার গৃহকর্মে বা যৌনকর্মে নারী পাচারের তুলনায় অনেকটাই আলাদা। চায়না থেকে পাত্রী আনার ব্যাপার অন্যান্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে পাত্রী চয়ন করার চেয়ে অনেকটাই আলাদা যেহেতু এইসকল দেশের মধ্যে নিয়মেরও ফারাক রয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে দালালির বৈশিষ্ট্যসমূহও এক এক জায়গায় এক এক রকম। যেমন বিবাহের ব্যুরো, ব্যক্তিগত দালালের মাধ্যমে, বা অনেক সময় মহিলা দালালের দ্বারা যাদের নিজেদেরও বিবাহ সংক্রান্ত অভিবাসন ঘটেছে, আবার কখনও খুব ইনফরমাল পরিবেশে। এই বিভিন্ন ধরনের মধ্যেকার যে সীমারেখা তা শক্ত পোক্ত নয়, এবং অনেকসময় এদের একসাথে কাজ করতেও দেখা যায়।

এটা ধরে নেওয়া হয় যে বিশ্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আন্তরাষ্ট্রীয় বিবাহ ও নারীদের বস্তু হিসেবে কল্পনা করার মানসিকতা বাড়তে থাকবে। ল্যু এর মতে আমাদের আরো বিভিন্নভাবে বানিজ্যিক বিবাহের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমত, ডেভিন এবং ডেল রোসারিও-র মতে বিবাহের ইচ্ছে, সামাজিক মর্যাদা, ভালোবাসার সন্ধান ইত্যাদি বিষয় কোন মহিলা বা তাঁর পরিবারের লোকেদের থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, বিবাহ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী এবং অবিরাম পরিষেবার চাহিদা বানিজ্যিক বিবাহ সংস্থাগুলির পরিষেবার মধ্যে সাধারনত থাকে না যদিও স্থানীয় স্তরে পরিষেবা প্রদানকারী দালাল বা ছোট সংস্থাগুলো কাযকর্মে এই দাবি পূরনের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়।

তাইওয়ানের ঘটনা বাদ দিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে দূরবর্তী বিবাহ বা যৌন কর্মের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়গের মাধমগুলি অনেক সময় মিলেমিশে যায়। বানিজ্যিক যৌন পরিষেবাসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অভিবাসনকারী মহিলাদের অর্থ উপার্জনের সহজতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় যেহেতু তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অন্যান্য কাজের সুযোগ খুবই সীমিত। বিবাহ অনেক সময়ে বাজি হিসেবে কাজ করে যা দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য থেকে বেরোতে, খারাপ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ তথা যৌন কর্মে লিপ্ত হতে এবং তাদের পরিবারকেও তাদের সেই কাজে সহায়তা করার প্রলোভন দেখায়। থেরেস ব্ল্যানচেট তাঁর গবেষনায় বাংলাদেশি মেয়েদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশী মহিলাদের বিবাহের পর উত্তরপ্রদেশের দরিদ্র পরিবারে বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং তাদের সেই পরিবারে নিয়ে আসা হয় পরিবারের জন্য সন্তান প্রজনন এবং শ্রম দান করার উদ্দেশ্যে। এইসব ক্ষেত্রে বল্পূর্বক বিবাহ, পণ বিবাহ, স্ত্রী কেনা বেচা, বিবাহের দ্বৈত শোষন দূরত্বের বিচারে এবং নারীদের বিক্রয়যোগ্য পন্য হিসেবে দেখার বিচারে –এই সমস্ত ধারনা কোথাও গিয়ে মিশে যায়।

বিবাহ পরবর্তী পিতৃস্থানিক বাসস্থানের ভিত্তিতে উত্তর ভারতের একজন যুবতী মহিলা বিয়ের পর তার পিতৃপরিবারের উপর তাঁর অধিকার হারায়। সম্পর্ক যদিও একদম শেষ হয়ে যায় এমনটা নয়। দূরত্বের ব্যবধান এবং খরচে যদি কুলায় তবে মাঝে মধ্যেই পিতৃগৃহে যাওয়ার অবকাশ থাকে তাদের। বিবাহবিচ্ছেদ বা বৈধব্যের পরে তাদের সম্পূর্ন অধিকার থাকে পিতৃগৃহে ফিরে আসার। যেসকল স্ত্রীদের কেনা বেচা করা হয় তাদের কোন রকম বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরী হয়না এবং তাদের পিতৃপরিবারের সাথেও তাদের বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকেনা। আত্মীয়স্বজনের থেকে তাঁর একটা দূরত্ব তৈরী হয়। ব্ল্যানচেট এর মতে এইরূপ

ব্যবস্থা অন্য ধর্মে বিবাহের ক্ষেত্রে আরও বেশী করে দেখা যায়। পিতৃগৃহের দূরত্ব বেশি হওয়ার ফলে মহিলাদের সমস্যা হয় যে তারা যদি কখনও গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয় তাহলে তাকে বাঁচানোর মতো কেউ থাকেনা। অন্যদিকে স্বামীর কাছে স্ত্রীয়ের গৃহ দূরে হওয়ার সুবিধে হল স্ত্রী সহজে তাঁর বাড়ি যেতে পারবেনা। বাংলাদেশী মহিলাদের উত্তর প্রদেশে এমন জায়গায় বিক্রি করা হয় যেখানকার ভাষা তারা জানেনা, মানুষদের চেনে না, যাদের ধর্ম আলাদা। এইসব কিছু ক্রয় করে আনা মহিলাদের পালানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

লং ডিসট্যান্স বিবাহ এবং আন্তরাষ্ট্রীয় বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের দ্বায়িত্ব নিয়ে বড়ো একট সমস্যা তৈরী হয়। অন্যদিকে চায়নাতে লং ডিসট্যান্স দালাল বিবাহের খেত্রেও তাদের মহিলাদের বিশেষ সমস্যা হয়না। কারন তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এবং যেসকল অঞ্চলে তারা বিবাহের পরবর্তীকালে যায় সেখানেও তাদের গৃহস্থালীর বাইরে কাজ করতে উতসাহিত করা হয়।

The Political Economy of Marriage Transanctions

বিবাহ সম্পর্কিত যে টাকার লেনদেন (পণ) তাকে ঐতিহ্য ও আচার হিসেবে তুলে ধরা হয় যার ফলে এই ব্যবস্থাসমূহ দূর হওয়ার পরিবর্তে আরো জাকিয়ে বসেছে। চায়নার ক্ষেত্রে যেখানে স্ত্রীধন এবং পন এর পরিমান অপেক্ষাকৃত বেশি সেখানে দেখা যায় যে প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের বিবাহ করার প্রচলন রয়েছে যেহেতু শহুরে মেয়েদের স্ত্রীধনের পরিমান অনেকটাই বেশি এবং শহরের আর্থিক দিক থেকে কম স্বচ্ছল লোকেদের সেই বিশাল পরিমান স্ত্রীধনের বিনিময়ে বিবাহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাইওয়ানিস পুরুষদের দক্ষিনপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মেয়েদের বিবাহ করা সেই তুলনায় জন্য লাভজনক ।

রঞ্জনা শীল এবং সিয়াং বিয়াও তাদের গবেষনায় তুলে ধরেছেন যে কিভাবে পণ প্রথা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিবাহ অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তা শ্রমের বিশ্বজনীনতার সাথেও কিভাবে জড়িত। পণ এর মধ্যে দিয়ে হাতে যে টাকা আসে তা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। পণ এর টাকা নিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করার ঘটনাও দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীরা পণ এর টাকা নিয়ে বিবাহের দু এক দিনের মধ্যেই পালিয়ে যায়। সিয়াং তাঁর গবেষনায় দেখিয়েছেন যে অন্ধ্রপ্রদেশের কাম্মা ও রেড্ডীরা পণের টাকায় প্রযুক্তিবিয়াদ্যায় পড়াশুনা করতে বিদেশে যায়। বিদেশে পড়াশুনা করে তারা সেই দেশে চাকরি নেয়। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা অনেকাংশে বেড়ে যায়। এই সামাজিক মর্যাদার জন্য তারা তাদের বোনেদের ক্ষেত্রে মোটা টাকা পণ দিয়ে বিদেশে অভিবাসনকারী পাত্রের সাথে তাদের বিবাহ দানে সমর্থ হয়। চলমান বিশ্ব অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল সস্তা, সহজলভ্য, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত শ্রমিক। ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে অভিবাসনকারী পাত্ররা তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার হয়ে কাজ করে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে যোগদান করে। অন্যদিকে তাদের স্ত্রীয়েরা পারিশ্রমিক অথবা বীনা পারিশ্রমিকে কাজ করে পরিবারকে ধরে রাখার জন্য। বিবাহ ও অভিবাসন এইভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদে যোগদান করছে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে পণ ও বিশ্ব অর্থনীতির যে সম্পর্ক তা একটু অন্যরকম। এই প্রসঙ্গে গাল্লোর গবেষনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কেরালা থেকে মহিলারা ইটালিতে

অভিবাসিত হয়ে সেখানে চাকরী শুরু করেন এবং তাদের সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটান। শুধু তাই নয় সেই মর্যাদা কাজে লাগিয়ে তারা তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করেন।

শীল ব্রিটিশ কলোম্বিয়া এবং কানাডার দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসনকারী পরিবারে কন্যার বিবাহের খরচ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ কিভাবে নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যম হয়ে ওঠে যেখানে বাড়ির মহিলাদের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে এবং কিভাবে তাদের কন্যাদের উপর সংসারের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়।

Immigration Rules State Laws and Marriage

অভিবাসন, বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কের উপর নানানভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে বহু গবেষণা-র কথা উল্লেখ করা যায়। চার্সলে ইউ কে-তে অভিবাসিত পাকিস্তানি পুরুষদের বিবাহের প্রসংগ তুলেছেন যেখানে তিনি বলেছেন যে এইসকল পাকিস্তানি পুরুষদের নিজের দেশের বা নিজের গোষ্ঠির মেয়ের সাথে বিবাহের প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে বিদেশে বিবাহের ক্ষেত্রে সেই দেশে একই গোষ্ঠির বা নিজের দেশ থেকে অভিবাসিত কারও সাথে বিবাহের প্রচলন রয়েছে। একই গোষ্ঠির পাত্র বা পাত্রীর সাথে বিবাহের মধ্য দিয়ে নিজের গোষ্ঠির মূল্যবোধসমূহ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার সুযোগ তৈরী হয়। দক্ষিণ এশিয়ার অভিবাসীদের কাছে বিবাহ হল নিজের পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ধরে রাখার এবং বিদেশে নিজের গোষ্ঠি পরিচয় তৈরী করার একটা মাধ্যম।চার্সলে বলেছেন যে অনেক সময় অভিবাসিত পুরুষেরা ধর্মীয় এবং আচরনগত রীতি নীতি ধরে রাখতে সাহায্য করে। অনেক সময় যুবক এবং যুবতীরা দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসীদের বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, আবার কখনও দেখা যায় যে তারা নিজের গোষ্ঠির বাইরে পছন্দ মত পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করছে । যার ফলে দেখা যায় যে পাত্র পাত্রী নির্বাচনে দু প্রজন্মের মধ্যে একটা সমস্যা তৈরী হয়।

অভিবাসীত ব্যক্তিদের তাদের নতুন জীবন সম্পর্কে এবং তাদের ছেড়ে যাওয়া পরিবার সম্পর্কে নানারকম ভাবনাচিন্তা রয়েছে। অভিবাসিত মহিলারা যে সমাজে বা যে দেশে থাকতে যায় সেখানকার মত করে তার নিজের জীবনকে সাজাতে চায়। তারা তাদের পিতৃপরিবার ও তাদের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য সচেষ্ট হয়। বিদেশে গিয়েও সে ও তার সঙ্গী নিজের গোষ্ঠির মানুষদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে । এবং তারা তাদের দেশে ফেলে যাওয়া পরিবার ও আত্মীয় স্বজনেরও খোঁজখবর ও খেয়াল রাখে । (গাল্লো, মান্ড)

তারা তাদের নিজেদের পরিবারের অনেকের অভিবাসনে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে তাদের সম্মান ও ভালোবাসা অর্জন করে আবার একইসঙ্গে "তারা নিজেদের পরিবারের দ্বারা ব্যবহৃত" এই অনুভূতি তাদের মনোকষ্ট দেয়। তারা বিদেশে গিয়ে উন্নতমানের জীবনযাত্রা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার অধিকারী হতে পারে আবার তারা ভীষণভাবে খুব খারাপ পরিস্থিতির অংশ হয়ে পরতে পারে। গৃহবন্দী থেকে পরিবারে ও বন্ধুদের থেকে দূরে তারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

অভিবাসন পরিবারের মধ্যেকার লিঙ্গ ভিত্তিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কাজের জন্য বাইরে যেতে হয় সেখানে স্বামী স্ত্রীয়ের দাম্পত্য জীবনে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র তাদের প্রদানকারী ও গ্রহণকারী-র ভূমিকায় পরিবর্তন আসে তা নয় সন্তান প্রতিপালনের জন্য যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক তৈরী করে। আচরনগত পরিবর্তন সেসব ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যেখানে পুরুষেরা কাজের সূত্রে বাইরে যায়। সেসব ক্ষেত্রে মহিলাদের সংসারের সব দায়িত্ব পালন করতে হয়। যদিও এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের কোন অধিকার থাকেনা। (গুলাটি, ১৯৯৩)। অভিবাসনের অন্যতম আরেকটি দিক হল তা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর একাধিক চাপ সৃষ্টি করছে। একাধারে তারা ঘরের বাইরে কাজ করছে, ঘরের ভেতর তারা মা এবং স্ত্রীয়ের দ্বায়িত্ব পালন করছে এছাড়া আরো একটি উপরি চাপ হল কন্যাসন্তানের জন্মদান। আবার অনেক সময় আমরা এমন ঘটনাও দেখতে পাই যেখানে স্বামী স্ত্রীয়ের নতুন স্থানে অভিবাসনের পর চাকুরীরতা স্ত্রী তার পরিবার ও তার স্বামীর চাকরির বাজারে ঢোকার সুবিধার্থে চাকরী ছেড়ে সংসার সামলান।

অভিবাসিত গোষ্ঠিগুলি সাধারনত বিদেশে গিয়ে নিজের গোষ্ঠীর মহিলাদের বিবাহ করতে আগ্রহী হয় এই ভেবে যে তারা শান্ত, ভদ্র, বাধ্য প্রকৃতির হবে এবং বিদেশের মাটিতে নিজের গোষ্ঠি পরিচয় পুনর্গঠন করা সহজ হবে। যদিও ইউ কে তে অভিবাসিত পাকিস্তানি ব্যাক্তিদের গবেষনা করে অন্যরকম চিত্র সামনে আসে। পাকিস্তানি পুরুষেরা ইউ কে তে গিয়ে পূর্বে অভিবাসিত গোষ্ঠির কন্যাদের বিবাহে আগ্রহী হয়। কিন্তু বিবাহের পর তারা নানারকম মানসিক সমস্যার শিকার হন। এই সমস্ত পুরুষদের মূলত তাঁর স্ত্রীয়ের পিতার ঘরে থাকতে হয় যেহেতু সেই দেশে নিজের বাড়ি কেনার মত অর্থ তাদের কাছে থাকেনা। কিন্তু এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে যেহেতু তারা পিতৃতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করেছে তাই স্ত্রীয়ের পিতার গৃহে ঘর জামাই হয়ে থাকাটা তারা মেনে নিতে পারেনা, এটি তাদের পুরুষত্বে আঘাত হানে। (আব্রাহাম, দাসগুপ্তা)

কানওয়াল মান্দের গবেষনায় দ্বৈত অভিবাসিত শিখ মহিলাদের বৈধব্য, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আলোচনা করেন অভিবাসন কিভাবে বৈধব্যের কলঙ্ক, শ্বশুরবাড়ির দুর্ব্যবহার, খুবই খারাপ বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরোনোর মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মান্দের মতে সামাজিকভাবে বিব্রত অবস্থা এবং পারিবারিক সমস্যার দরুন বিধবা বৃদ্ধাকে মেয়ের সংসারে থাকতে বাধা দেওয়া হয়। উত্তর ভারতীয় আত্মীয়তার সম্পর্কে বিধবা মায়েদের তার সন্তানের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ানোর নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। মেয়েদের সংসারে থাকা সেখানে ছোট করে দেখা হয়। মান্দ আরও বলেছেন যে মহিলাদের ঠাকুমা হিসেবে অবৈতনিক শ্রমদান , কন্যার সন্তানদের দেখাশোনা করা যাতে কন্যা চাকরি করতে যেতে পারে, নাতি নাতনীদের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি কোনকিছুই তাদের ভেঙে যাওয়া আত্মসম্মান বাড়ানোর পথে সহায়ক হয়না।

অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজনদের থেকে দূরে থাকার ফলে স্বামী স্ত্রীয়ের দাম্পত্য জীবনে একটা নেতীবাচক প্রভাব পড়ে। চাইনিজ, ইন্দোনেশিয়ান, পাকিস্তানী, বাংলাদেশি এবং ভারতীয় স্ত্রীয়েরা যারা বিদেশে থাকে তারা বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে তাঁর নিজের আত্মীয় পরিজন এবং তার পিতা মাতার থেকে অনেক দূরে চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের পরে পতিগৃহে গিয়ে স্ত্রীদের তার নিজের বাড়ি আসা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা যা তার নিজের এবং তার পিতা মাতার কাছে মন খারাপের কারন হয়ে ওঠে।

অভিবাসন সংক্রান্ত গবেষনায় আলোচনা করা হয় যে অপেক্ষাকৃত গরীব এবং সংরক্ষনশীল সমাজের মহিলাদের অবস্থা একমাত্র উন্নত হতে পারে যখন তারা আধুনিক ও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজে যায় এবং সেখানে বৈতনিক শ্রমদানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই ধারনার সমালোচনা করে বলা হয় যে এই আলোচনায় অভিবাসনের পূর্বে মহিলাদের নিজেদের সমাজে বৈতনিক শ্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়নি। তাছাড়া অভিবাসিত হওয়ার পর নতুন সমাজে গিয়ে তাদের নানা রকম শোষনের শিকার হতে হয় যেমন গার্হস্থ্য হিংসা, একইসাথে ঘরের এবং বাইরের কাজের বোঝা, জাতিবাদ, নতুন রকমের সামাজিক নিয়ন্ত্রন যা মহিলাদের উপর আরোপিত হয় এইসব উন্নত সমাজের মহিলাদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনা। গার্হস্থ্য হিংসা, বিবাহ বিচ্ছেদের পরে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব, বৃদ্ধা মহিলাদের করুন পরিস্থিতি সকল সমাজেই কমবেশি রয়েছে কিন্তু অভিবাসনের ফলে এইসকল সমস্যার পরিধি ও গভীরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

Immigration Rules, State Laws and Marriage

লিঙ্গ, অভিবাসন, বিবাহের সাথে যখন রাষ্ট্রীয় আইন, আদর্শ এবং কার্যাবলী যেখানে অর্থনৈতিক, জাতিগত বিষয় এবং পিতৃতান্ত্রিক আচার সমূহ মিলে মিশে থাকে সেখানে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন যেমন ১৪৩-তম ILO কনভেনশন (১৯৭৫) এবং ইউরোপিয়ান কনভেনশনের ৮ নম্বর ধারায় মানবিকতার ভিত্তিতে পরিবারের একত্রিত হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়। আশ্রয় প্রদানকারী দেশগুলোর সরকার এই বিষয়ে সচেতন যে পারিবারিক অর্থসাহায্যের ভিত্তিতে অভিবাসিত হওয়ার অর্থ হল তা অর্থনৈতিক অভিবাসন এবং যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হবে তাদের দেশে। প্রতিটি রাষ্ট্র তাই পরিবারের পুনর্মিলনের বিষয়টিকে নির্দিষ্ট্য করার চেষ্টা করে অভিবাসন আইনের মধ্য দিয়ে যেমন আর্থিক সাহায্যকারীদের অবস্থা নির্দিষ্ট্যভাবে ব্যক্ত করে যেমন তাদের উপার্জন ও তাদের বাসস্থান সংক্রান্ত কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়ে। পরিবারের পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে বিবাহ অভিবাসন এবং যে দেশে অভিবাসন করা হয়েছে সেখানকার পরিস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারনে নানারকম আইনী এবং প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হয় খতিয়ে দেখার জন্য যে বিবাহ প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে কিনা। অভিবাসনকারী ব্যক্তি এবং তাদের গ্রহনকারী রাষ্ট্রের প্রশাসনের মধ্যে ইঁদুর বিড়াল খেলা চলে। অভিবাসনের নিয়মগুলো সাধারনত অভিবাসনকারীদের নিজের দেশের সাংস্কৃতিক রীতি নীতি, লিঙ্গ, বিবাহ, পারিবারিক নিয়মসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে মনে করা হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ এর মধ্যে ভারতের অভিবাসী মহিলাদের উপর ব্রিটিশ প্রশাসনের বিবাহের সত্যতা প্রমানে ভার্জিনিটি পরীক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আচরণবিধি দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেহেতু ভারতীয় সংস্কৃতিতে মনে

করা হয় যে বিবাহের পরই মহিলারা শুধুমাত্র ভার্জিনিটি হারাতে পারে। তাই ভার্জিন না হওয়ার অর্থই হবে অবিবাহিতা।

মার্গারেট আব্রাহাম তাঁর কাজে অভিবাসনের ও ভিসার সঙ্গে গার্হস্থ্য হিংসার একটি চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর গবেষনায় দেখা গেছে যে ভারতীয় অভিবাসনকারী মহিলারা ভিসার মধ্য দিয়ে বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পায়। কিন্তু বিদেশে অভিবাসিত হওয়ার পর অনেক সময়ে তারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয় কিন্তু তা সত্বেও তাদের স্বামীর সঙ্গে তাদের থাকতে হয়। যেহেতু স্ত্রীয়ের ভিসা স্বামীর ভিসার উপর নির্ভরশীল তাই তাদের উপর যতই অত্যাচার করা হোক না কেন তারা তাদের স্বামীর সঙ্গেই ববাবাস করতে হয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে গোষ্ঠি ও ব্যক্তিগত স্তরে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বেশ কিছু মহিলা অভিবাসনকারীর দল তাদের গোষ্ঠির নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন অভিবাসীত মহিলাদের উপর গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনাকে তুলে ধরা ও তা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থার দাবিতে। দুঃখের বিষয় হল এই সংগ্রামের সুফল দেখতে পাওয়া যায় এমন এক সময়ে যখন অভিবাসনকারীদের প্রতি একটা বিদ্বষ তৈরী হয় আমেরিকানদের মনে , বিশেষ করে ৯/১১ এর ঘটনার পরবর্তী সময়ে। অভিবাসী বিরোধী মানসিকতা অভিবাসনকারী মহিলাদের উপর ঘটা গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচেষ্টায় জল ধেলে দিল।

কৃতি সিং এর গবেষনায় উঠে এসেছে কিভাবে পিতা মাতার সম্পর্কের তিক্ততা ছেলে মেয়েদের প্রভাবিত করছে। অনেক সময়ে বিদেশে অভিবাসিত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীয়ের মধ্যেকার বিবাদ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছয় যে দুজনের কোন একজন অন্য স্থানে চলে যায় এবং পিতা বা মাতার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিশুদের মনের গভীর একটা প্রভাব পরে। ভারতের মত দেশে যেখানে পিতা বা মাতার সন্তানের উপর দায়িত্ব পেতে দীর্ঘদিন লেগে যায় সেখানে সমস্যা আরো জটিল। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, গার্হস্থ্য হিংসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন সুষ্ঠূভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন যেহেতু বিবাহ সম্পর্কিত অভিবাসনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

Marriage Migration in Comparative Perspective

এই অংশে এশিয়ার মহিলা ও পুরুষদের দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে অভিবাসনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র মহিলা ও পুরুষদের স্থানান্তর নয়, বিবাহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, যে গুরুত্ব তাও এশিয়ানদের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসনের সাথে সাথে পালটে যায়। প্রথমত, আমরা দেখতে পাই যে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন রকমের আচার ও রীতি নীতি থাকলেও সমগ্র এশিয়া জুড়ে দেখা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানটি খুবই লিঙ্গভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক , অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ামূহের ধারক হিসেবে একটি সমালোচনামূলক ভূমিকা পালন করে এই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি ।

দ্বিতীয়ত, এইসকল প্রক্রিয়াসমূহ ব্যক্তি এবং তার পরিবারে এসে তাদের বিবাহ ও অভিবাসনের ইচ্ছেগুলোর সাথে তাদের সংযোগ ঘটায়। এক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিবাহ ও শ্রমের বাজার একসাথে কাজ করে যা আবার স্থানীয় আত্মীয়তা ও বৈবাহিক রীতিনীতি কে প্রভাবিত করে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সম্বন্ধ স্থাপনের পদ্ধতিসমূহ তুলনামূলক সমাজতত্ত্বের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ন দিক। দক্ষিন এশিয়ার পিতৃবংশীয় এবং দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার দ্বৈত বংশীয় পরিবারে শ্রম এবং বিবাহ সম্পর্কিত অভিবাসন এবং সম্বন্ধ স্থাপনের তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক।

চতুর্থত, বিবাহ সম্পর্কিত সম্পদের হস্তান্তর (স্ত্রীধন বা পণ)। ঐতিহ্যগত রীতিনীতিসমূহ যেমন পণ, স্ত্রীধন, অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ এইসমস্ত কিছুই অভিবাসনের ক্ষেত্রে আরো বেশী করে করা হয়। পরিবার এবং গোষ্ঠিসমূহ যৌতুক প্রদান ও বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজের সামাজিক মর্যাদা জাহির করার চেষ্টা করে দেশে অভ্যন্তরে এবং বাইরে, নিজের গোষ্ঠী এবং যে গোষ্ঠিতে বিবাহ হচ্ছে সেখানেও। বিবাহে যে পরিমাণ অর্থ পণ হিসেবে দেওয়া হয় তা অভিবাসনের ক্ষেত্রে বা নতুন জায়গায় গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করার ক্ষেত্রে উপযোগী প্রমানিত হয়।

পঞ্চম বিষয় হল বিবাহে বিভিন্ন রকমের টাকার যৌতুক , এবং পণ প্রদান এবং সমাজে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার মধ্যেকার সম্পর্ক। ভারতের নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা মহিলাদের প্রতিকূল লিঙ্গ অনুপাত, নারীদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের বেহাল অবস্থা, পারিবারিক সম্পত্তিতে অধিকার খর্ব, এবং অধিক পরিমানে পণ এইসমস্ত বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র খোজার চেষ্টা করেছেন। দক্ষিন এশিয়ায় স্ত্রীয়ের পরিবার স্বামীর পরিবারে বিপুল পরিমান যে পন দেয় তাকে ক্ষতিপূরন হিসেবে দেখা হয় যেহেতু তাদের চাকুরিহীন কন্যার ভরণপোষনের দ্বায়িত্ব তার স্বামী নিচ্ছে । অন্যদিকে স্ত্রীধন দেওয়া হয় মেয়ের পরিবারে যেখানে মেয়েদের কে ইতিবাচক মূল্য দেওয়া হয়। মেয়ের পরিবার তাদের একজন সদস্যের শ্রমক্ষমতা হারাচ্ছে তাই এটি মেয়ের পরিবারে ক্ষতিপূরনস্বরূপ দেওয়া হয়। যদিও এখন বহূদিন হল স্ত্রীধন দেওয়ার চল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং পণ এর পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে । এই চিত্র দক্ষিন এশিয়ায় মহিলাদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদার দিকেই ইঙ্গিত করেছে (মিলার, শ্রীনিবাস) ।

বিবাহের লেনদেন ও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্ক তুলনামূলক ভাবে বিভিন্ন গবেষনায় উঠে এসছে। চায়নাতে ভারতবর্ষের মতই নারীদের প্রতিকূল লিঙ্গ অনুপাত, পিতৃস্থানিক পরিবার, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে কিন্তু এখানে মহিলাদের শ্রমে অংশগ্রহনের পরিমান এবং স্ত্রীধনের পরিমান অনেকাংশে বেশি যা মহিলাদের গৃহস্থালীর বহির্ভূত কাজে অধিক সংখ্যক অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করে।

চায়নার স্ত্রীধনের মত ভারতে পণের পরিমানে অত্যধিক পরিমানে বেড়ে গেছে বিশেষ করে উদারনীতিবাদের ফল হিসেবে। বিশেষ করে সেই সকল সমাজে যেখানে পারিবারিক সম্পর্ক মাতা এবং পিতা উভয়ের দিক থেকেই নির্ধারিত হয় সেখানে বিবাহ সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেন এবং প্রতিকূল লিঙ্গ অনুপাত বিশেষ সমস্যার কারন হয়না। এইসকল সমাজে বৈবাহিক সম্পর্কগুলোও খুব ক্ষনস্থায়ি হয়। এই পার্থক্য বিভিন্ন পরিবারের মধ্যেকার জটিল বিবাহ সম্পর্কিত আদানপ্রদান, পণ ও স্ত্রীধন, পিতৃবংশীয় ও পিতৃস্থানিক নিয়ম ও রীতি নীতি, আজীবন বৈবাহিক সম্পর্ক, ক্রমবর্ধ্মান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সর্বশেষ প্রশ্ন হল অভিবাসন, বিবাহ ও পরিবার এর বিষয়ে নারীদের নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সুবিধা এবং প্রতিকূলতা। পুরুষ ও নারী যে সকল বিষয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তা অনেকাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ, ঐতিহাসিক ও সাংকেতিক উপাদানসমূহ, সাংস্কৃতিক নির্মানসমূহ যেমন লিঙ্গ, যৌনতা, শ্রেনী, জাতি ইত্যাদির উপর। নারীদের পরিস্থিতি তাদের যতটা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরিসর দেয় তারা সেই পরিসরে থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তারা অনেক সময়েই তাদের বিবাহের চাপ থেকে মুক্ত হতে, স্বাধীনভাবে কর্মজীবনে যোগদান করার লক্ষ্যে, তাদের পারিবারিক সম্পর্ক-কে নতুনভাবে গোছাতে অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসছে কিভাবে নারী-রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ভাবে তাদের নিজের মতামত প্রয়োগ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে, নিজের ইচ্ছে ও অনিচ্ছে জাহির করার মধ্য দিয়ে, পারিবারিক ও আত্মীয়তার কাঠামোয় পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে কাজ করার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের Agency বা মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করে।